ভবিষ্যৎ কি শুকিয়ে যাবে

সৌমেন নাগ

পরিবেশ ও উন্নয়নের আলোচনাটা শেষমেশ গিয়ে দাঁড়ায়— উন্নয়ন বনাম পরিবেশ। মুশকিলটা হল, উন্নয়নের দৌড়ে তাক্ লাগাবার মানসিকতায় দেশ পরিচালকেরা পরিবেশের দাবিটিকে মনের কোনে জায়গা দিতে চাননি। ফলে, উন্নতির উন্মত্ত মাদকতার স্রোতে ভাসমান রাষ্ট্রপিতারা পরিবেশের ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতিশোধে প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখে আজ আতঙ্কে চোখে বুজে ফেলছেন। আজ তাই উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অন্যের পরিপূরক না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের সংজ্ঞাটাই শুধু যে পাল্টেছে তাই নয়, বলা যায়, দ্রুত হারে ক্রমান্বয়ে পাল্টে চলেছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে পরিবেশ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'poverty is the most pollutant'। দারিদ্র্যই যদি পরিবেশ দূষণের মূল কারণ হয়ে তাকে তবে তো ধনী ও উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশের সমস্যা থাকার কথা নয়। এক সময় বলা হত, আয় বৃদ্ধির আরেক নাম উন্নয়ন। কিন্তু দেখা গেল, গড় আয় বাড়লেও দারিদ্র্যের সমস্যাটা উন্নয়নের ধারণাকে গভীর প্রশ্নের মধ্যেই রেখে দিল। এবার তাই জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়নের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে দিতে হল।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে উন্নয়নের নামে এখানে অনেক বড় বড় প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে, গড় আয়ও বেড়েছে, কিন্তু ধনী - দরিদ্রের ব্যবধান কমার বদলে বরং বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যাপারটায় যে খুব একটা মাথা ঘামানো হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। ফলে উন্নতির নামে যে প্রকল্পগুলি— তার প্রভাব একদিকে পড়ছে পরিবেশের ওপর আর অন্যদিকে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ এই প্রকল্পগুলিকে তাদের স্বার্থ বিরোধী বলে মনে করেছে। উন্নতির সঙ্গে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের একটা উদাহরণ ইউরোপ এবং আমেরিকার শিল্প বিপ্লব। একদিকে জনসংখ্যার চাপ ও অন্যদিকে শিল্প বিপ্লবে ইউরোপের দেশে দেশে যে নগরায়নের প্রসার ঘটেছিল তার প্রথম শিকার হয়েছিল পরিবেশ। ইউরোপের বনভূমিকে এই উন্নয়নের জন্য শহীদ হতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জনসংখ্যার চাপ ছিল কম। তবু পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব দখল রাখতে তারা যে দ্রুত গতিতে কাঁচামালের ভোগ ও বল্গাহীন গতিতে শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার ধাক্কায় গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সে দেশের পরিবেশ বিপন্ন হতে হতে আজ শেষ সীমানাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার এই সমস্যা তখনও এতখানি প্রচট হয়নি যদিও সেখানে ছিল জনসংখ্যার বিরাট চাপ। এর কারণ সেখানে তখনও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ছিল কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখানেও ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। উন্নতির ভাবনায় নানা প্রকল্প নেওয়া হলেও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রবল ভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে, এই উন্নয়ন বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। প্রশ্নটা তাই কার উন্নয়ন, কীসের উন্নয়ন?

ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেবার জন্য কৃষির উন্নয়ন হিসেবে দেখানো হল সবুজ বিপ্লব । তবু উড়িষ্যার বেলেঙ্গানিতে খেতে দিতে না পেরে নিজের নাড়ি কাটা অমৃত ফসলকে ২০ টাকার বিনিময়ে মা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কৃষকেরা ফসলের উৎপাদন মূল্য না পেয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা জানি, উন্নয়নের বিজয় কেতন বড় বাঁধ, বিদ্যুৎ আর সেচের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তবু কেন বাঁধ প্রকল্পকে ঘিরে মানুষের বিক্ষোভ? মনে রাখতে হবে, বড় বাঁধ আর জলাধার নির্মাণ করতে এখন পর্যন্ত ভারতে এক কোটিরও বেশি মানুষ তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওল্টার ফার্নাণ্ডেজ, জে সি দাসও শ্যাম রাও 'Displacement and Rehabilitation - An Estimate of Extent and Prospect (1980)' প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের কতজনকে তাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত হতে হয়েছে এবং কতজনকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া গেছে তার যে হিসেব দিয়েছেন তা নীচে দেওয়া হল :

প্রকল্পের শ্রেণী	বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা	পুনর্বাসনের সংখ্যা	পুনর্বাসনের অপেক্ষায়
কয়লা ও অন্যখনি	১,৭০,০০০০	৪,৫০,০০০	১২,৫০,০০০
বাঁধ ও খাল	১,১০,০০,০০০	২৭,৫০,০০০	৮২,৫০,০০০
শিল্প	২০,০০,০০০	৩০০,০০০	১৭০,০০০
অভয়ারণ্য বা উদ্যান	৬,০০,০০০	১৫০,০০০	৪৫০,০০০
অন্যান্য	১২,০০,০০০	৩,০০,০০০	৯,০০,০০০
মোট	১,৬৫,০০,০০০	৩৯,৫০,০০০	১২৫,৫০,০০০

অর্থাৎ ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতেই দেখা যাচ্ছে, মোট ১৬৫,০০,০০০ বাস্তুচ্যুত মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৯, ৫০,০০০ জনকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া গেছে। উন্নয়নের পতাকা ওড়াতে ঐ সময়ে যে ১,২৫,৫০,০০০ মানুষ অপেক্ষমান ছিল তার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

জনজাতির ঐতিহ্যের কী হবে

পরিবেশ বলতে শুধু বনভূমি, নদী, সমুদ্র বা বাতাসকেই বোঝায় না। পরিবেশের মধ্যে পড়ে জনজাতির ঐতিহ্য ও তাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাও। তাই পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা জমির বদলে অন্যত্র জমি দেওয়াই যথেষ্ট নয় এ কথা মনে রাখতে হবে। আদিবাসী ভূমিপুত্রদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে দিকে নজর রাখাটাও অত্যন্ত জরুরি। পুনর্বাসনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ঐ সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি পুনর্বাসনের পর তাদের জীবনযাত্রার মান যাতে বাস্তুচ্যুত হবার সময় যেমন ছিল তার থেকে উন্নত অথবা নিদেনপক্ষে তা

বজায় রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা। পুনর্বাসনের আগে জীবনযাত্রার মানকেই ধরে রাখা যদি পুনর্বাসনের লক্ষ্য হয়ে পড়ে তবে ঐ প্রকল্পগুলি কিন্তু ঐ সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষগুলির কাছে উন্নয়নের কোনও বার্তা হয়ে আনতে পারবে না। তাই, আদিবাসী ভূমিপুত্রদের সাংস্কৃতিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এদের সমাজজীবন পরিচালিত হয় যৌথভাবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলি এদের জীবনে প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে বিদ্যমান। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডাদের কথাই ধরা যাক। মুণ্ডাদের জীবনে 'সরণা' অর্থাৎ আত্মার বাসগৃহ, 'ধুমকুরিয়ো' (যুবক - যুবতীদের জীবনকে জানার যৌথগৃহ), 'ইরগন্ডি' (পূর্বপুরুষদের অস্থিকে কবর দেওয়ার জায়গা) — এইসব তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের সামাজিক জীবনের এই দিকটা সংরক্ষণের ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার কথাটা মাথায় না রাখলে মুণ্ডারা নতুন জায়গাকে মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারবে না। উপড়ে আনা বটগাছকে শুকনো মাটিতে বসিয়ে দিলে যেমন সে শুকিয়ে মরে যায়, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা না ভেবে তাদের পুনর্বাসনের কথা ভাবলে তাদের সামাজিক জীবনও কিন্তু একইভাবে শুকিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়েছে তা ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করেছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এই বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে প্রতি বছর গড়ে ৫ লক্ষ অধিবাসী তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলেছে। এদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব না দিয়ে যে অস্থিরতা ডেকে আনা হয়েছে তাকে অস্বীকার করার আর কোনও উপায় নেই।

স্বাধীনতার পর সারা দেশে ১৬০০-র ওপর বৃহৎ বাঁধ এবং কয়েক হাজার ছোট ও মাঝারি সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে বিশাল এলাকা জলের তলায় তলিয়ে গেছে এবং অপর এক বিশাল এলাকা লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ১৯৮৫ সালের হিসেবেই প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে (Whose Nation? The Displaced as Victim of Development; Sumita Kundu, EPW, June 19, 1996)। ৫০ মিটার উচ্চতার ওপরে ২০টি প্রধান বাঁধ নির্মাণের ফলে এদেশে যে ১১.৬ লক্ষ মানুষ তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তার ৫৯ শতাংশই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ১১০টি প্রকল্পে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, ঐ প্রকল্পগুলির জন্য যে ১৬.৯৪ লক্ষ মানুষকে তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল তার মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪.১৪ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ (Govt of India Working Group on Development and Welfare of ST during 8th Five-Year Plan)। উল্লেখ্য, তফসিলী জাতি ও উপজাতি কমিশনের ২৯তম প্রতিবেদনে জানা যায়, উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ হলেও বাস্তুচ্যুত মানুষের শতকরা ৪০ ভাগই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন খনিজ সম্পদের আহরণ। কিন্তু সম্পদের বন্টনে যদি জীবনধারণের মানের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার না দেওয়া হয় তবে তাকে যেমন উন্নয়ন বলা নিয়ে দ্বিধা থাকে তেমনি তা পরিবেশের পরিপন্থীও হয়ে ওঠে। খনিগুলি প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। খনি কাজে যেমন উপজাতিরা এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্বাস্তু হয়েছে অন্যদিকে এই কাজে জলস্তর নেমে যাওয়ার কৃষিযোগ্য জমি তার উর্বরতা হারিয়েছে, ফলে বনভূমি বিনষ্ট হবার জন্য পরোক্ষভাবেও এই অঞ্চলের আদিবাসীদের তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে।

সরকারের তরফ থেকে পুনর্বাসনের জন্য কিছুই করা হয়নি এমন অভিযোগ ঠিক নয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ভাবনার মধ্যে যে যান্ত্রিকতার মনোভাব প্রকাশ পায় তা বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলে। ভারতের গর্ব ভাক্‌রা নাঙ্গালে বহুবিধ সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ১৯৫০ সালেই হিমাচল প্রদেশের বিসালপুর এবং উনা জেলার ২১০৮ টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। ২৫ বছর বাদে দেখা যাচ্ছে, এই বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির মধ্যে মাত্র ৭৩০টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছে। হিমাচল প্রদেশের পঙ্গ বাঁধের ফলে ১৯৬০ সালে ৩০,০০০ পরিবার তাদের বাসভূমি থেকে উৎপাটিত হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ১৬,০০০ পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী বলে সরকারি ভাবে বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৩৭৫৬টি পরিবারকে হিমাচল প্রদেশ থেকে কয়েক'শ মাইল দূরে পরিবেশ ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত রাজস্থানের এমন একটি জায়গায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে তাদের জন্য নির্ধারিত জমির এক বিরাট অংশই আগে থেকে অন্যেরা দখল করে বসতি স্থাপন করেছিল। এছাড়াও , বাস্তুচ্যুত পরিবারের সংখ্যা নিয়েও সরকারের পক্ষ থেকে আছে নানা কারচুপি। বহু ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংখ্যাকে চেপে রাখা হয়। হীরাকুঁদ বাঁধে সরকারি হিসেবে ভূমি থেকে উৎপাটিত মানুষের সংখ্যা বলা হয়েছিল ১,১০,০০০ কিন্তু বেসরকারি সূত্রের হিসেব হল ১,৮০,০০০। বিশ্বব্যাঙ্কের বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সাহায্যে মর্স কমিটি জানিয়েছেন, বাঁধ ও খাল নির্মাণের জন্য ১,৭৫, ০০০ মানুষ তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত হবে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের হিসেব, ২,০০,০০০ -এর বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বাসভূমি হারাবে আর শোলাপানেশ্বরের অভয়ারণ্য ধ্বংসপ্রাপ্তি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদির মতো পার্শ্ব প্রক্রিয়ার ফলে উৎপাটিত জনসংখ্যা ধরলে মোট ৪,০০,০০০ মানুষ এই প্রকল্পের জন্য বাস্তুচ্যুত হবে।

১৯৮১ - ৮৫ সালের মধ্যে সেন্ট্রাল কোলফিল্ড ১,২০,৩০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। ইস্টার্ন কোলফিল্ড ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন অধিগ্রহণ করেছিল ৩০,০০০ একর জমি। এর ফলে ৩২,৭৫০ টি পরিবার জমি থেকে উৎখাত হয়েছে, অথচ, ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে চাকুরি হয়েছিল মাত্র ১১,৯০১ জনের। দিল্লীর কাছে দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা সরবরাহের প্রয়োজনে উত্তর করণপুরাতে ৬.৩৮ বর্গ কিমি জুড়ে পিপারওয়ার কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য সরকারিভাবে বলা হয়েছিল দুটো গ্রামের ৪৬০ টি পরিবার ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবে। প্রকতৃপক্ষে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি— ১৮টি গ্রামের কম করেও ১৫,০০০ আদিবাসী এর ফলে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিল। দিল্লী মহানগরী আলোয় ঝলমল করুক, সেখানকার শিল্প ভারতের জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি ঘটাক, এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এর বিনিময়ে আদিবাসীদের হারাতে হচ্ছে হাজারিবাগ জেলার উর্বরতম ধান চাষের জমি ও বনভূমি। এর চেয়েও বড় কথা, এই অঞ্চল ঘিরে আদিবাসী জীবনযাত্রার প্রাক্ - ঐতিহাসিক যুগের পুরাকীর্তিগুলিও এর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। থেথাঙ্গি এবং ইসকোর গুহাতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র। পিপারওয়ার খনি অঞ্চলের আশেপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন যুগের নানা প্রস্তর নির্মিত নিদর্শন ও কবরভূমি। হাজার মাইল দূরের নগরের প্রয়োজন মেটাতে তাই হাজারিবাগ জেলার উত্তর করণপুরা উপত্যকার আদিবাসীরা শুধু জমি থেকেই উচ্ছেদ

হচ্ছে না, সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেলছে তাদের ঐতিহাসিক চিহ্নগুলিকেও। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প একাই ৮৪,১৪০ একর জমি থেকে ৯৩,৪৭৪ জন মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। এর মধ্যে ৩৭,৩২০ একর জমি ছিল কৃষি জমি। রাউরকেল্লা ইস্পাত প্রকল্প, খনি ও মন্দিরা বাঁধের জন্য ৩২,৫৭৬.৭১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এর জন্য ৪২৫১ টি পরিবারকে ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল যার মধ্যে ২০৭৪টি ছিল আদিবাসী পরিবার। কোরাপুট জেলা উড়িষ্যার বৃহত্তম জেলা। এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশই (৫৬ শতাংশ) আদিবাসী। এই জেলার ১৮টি বৃহৎ প্রকল্পের জন্য যে মোট ৫,০০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য এক লক্ষের মতো আদিবাসীকে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত হতে হয়েছে। যে ৪,০০,০০০ একর জমি সহ বনভূমি ছিল আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তা বিনষ্ট হয়েছে।

প্রোমোটার রাজের গপ্পো

কোনও প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি জমি নিয়ে যে ফটকাবাজি শুরু হয়ে যায় তাতেও কিন্তু আদিবাসী সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলেছে। আসলে কী হয়, যখন কোনও প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয় তখন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অরিকিক্ত জমি অধিগ্রহণ করে রাখা হয়। উদ্দেশ্য, প্রকল্পটি রূপায়িত হবার পর জমির মূল্য যখন আকাশচুম্বী হবে তখন তা প্রচুর মুনাফা অর্জনের জন্য বিক্রি করা। এক্ষেত্রে মুম্বইয়ের জহরলাল নেহেরু পোর্টের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই বন্দরের জন্য যত পরিমাণ জমির দরকার ছিল (ভবিষ্যতের প্রসার পরিকল্পনা সহ) তার থেকে অনেক বেশি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পরে এই উদ্বৃত্ত জমি নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করা হয়। এই বিক্রি থেকে প্রান্তিক চাষী বা জেলে, যারা এই প্রকল্পের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, তাদের প্রাপ্তির ঘর ছিল শূন্য।

উন্নয়নের নামে আরেকটা শিল্প এখন পরিবেশকে গলা টিপে ধরেছে। সেটি হল নগরায়নের মুখোশের আড়ালে বহুতল প্রোমোটার রাজ শিল্প। এদের জীবন্ত উদাহরণ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে চাঁদমণি চা - বাগানকে উচ্ছেদ করে 'মেগাসিটি' গড়ার পরিকল্পনা। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে অবস্থি চাঁদমণি চা বাগানের আয়তন ছিল ৮৫০ একর। এই চা-বাগান শিলিগুড়ি শহরের ইঁট - পাথর জঙ্গলের মধ্যে মুক্ত ফুসফুসের কাজ করত। শিলিগুড়ি শহর তার নানা উন্নতির কর্মসূচিতে এই বাগানের জমি ক্রমাগত থাবা বসিয়ে এসেছে। এখন তার আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬৬৪ (প্রায়) একরে।

প্রকৃতির অভিঘাত?

এতো সকলের জানা যে দক্ষিণের ইণ্ডিয়ান প্লেট উত্তরের ইউরেশিয়ান প্লেটের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। এর ফলে হিমালয় পর্বতমালা ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ হিমালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভূস্তরে চলেছে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া। সুনামি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই প্লেটগুলির ঠোকাঠুকিতে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে। প্রকৃতির এই গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে প্রকৃতির ওপর বোঝা চাপাতে চাপাতে মানুষ যখন বেহিসেবি হয়ে পড়ে তার পরিণাম কী হতে পারে তার প্রমাণ ১৯৬৭ সালের কয়না বাঁধের ভূমিকম্প। বাঁধের স্ট্রাকচারের ভার এবং বাঁধে আটক জল এই দুয়ে মিলে যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শিলায় প্রবেশ করে দুর্বল স্তরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

> **''আজ উন্নয়নের আরেক নাম প্রোমোটার রাজ। তাদের মুনাফার মৃগয়ায় ভূস্তরের সহন ক্ষমতাকে আমল দেওয়া হচ্ছে না। পার্বত্য অঞ্চলের যত্রতত্র গড়ে উঠছে বহুতল বাড়ি। দার্জিলিং-এর কেন্দ্রস্থলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ৮-১০ তলার বিশাল রিঙ্কমল কমপ্লেক্স। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে গ্যাংটকে ভয়াবহ ধ্বসে ৫২ জনের মৃত্যুর পর সিকিম সরকার আইন সংশোধন করে বলেছে ১৫ মিটারের উচু কোনও বাড়ি নির্মাণ করা যাবে না''**

একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে বিভিন্ন শহরগুলিতে। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল সহ শিলিগুড়ির এই ইঁট-পাথরের জঙ্গলের কথা ভাবলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। এই অঞ্চলটিকে নগরায়নের নামে বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবল ভূমিকম্পন এলাকা ৪ নং জোনে এর অবস্থানটাই বড় কথা নয়, দুপাশের ৫ নং জোনের (জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বৃহৎ অংশ) এলাকা যে কোনও সময়ে এখানে প্রসারিত হতে পারে। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে যতই সমালোচনার কারণ থাকুক না কেন পরিবেশ সম্পর্কে তাদের সাবধানতাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। তারা পার্বত্য এলাকায় দোতলার বেশি বাড়ি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে দুর্বল অংশকে চিহ্নিত করে তারা সেখানে কোনও কংক্রিট স্ট্রাকচার নির্মাণে অনুমতি দেয়নি। তারা এ দেশটাকে দখল করতে এলেও বুঝেছিল যে হিমালয়ের মতো নবীন পার্বত্য এলাকায় বড় ধরনের ভূতাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা ঘটালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। অথচ আজ উন্নয়নের আরেক নাম প্রোমোটার রাজ। তাদের মুনাফার মৃগয়ায় ভূস্তরের সহন ক্ষমতাকে আমল দেওয়া হচ্ছে না। পার্বত্য অঞ্চলের যত্রতত্র গড়ে উঠেছে বহুতল বাড়ি। দার্জিলিং -এর কেন্দ্রস্থলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ৮-১০ তলার বিশাল রিঙ্কমল কমপ্লেক্স। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে গ্যাংটকে ভয়াবহ ধসে ৫২ জনের মৃত্যুর পর সিকিম সরকার আইন সংশোধন করে বলেছে ১৫ মিটারের উঁচু কোনও বাড়ি নির্মাণ করা যাবে না। কিন্তু এর মধ্যে শৈলশহরে যে বিশাল বিশাল বহুতল বাড়িগুলি নির্মিত হয়ে গেছে সেগুলি ভাঙ্গার ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রভুদের নেই। ফলে, আবার এক ভয়াবহ ধ্বস বা ভূমিকম্পের আশঙ্কাকে বুকে নিয়ে একানকার মানুষদের নিত্য বাস।

পাশাপাশি, হিমালয়ের পাদদেশে অস্থির ভূখণ্ডে অবস্থিত শিলিগুড়ির 'উন্নয়ন' - এর জন্য চাঁদমণির সবুজকে উপড়ে ফেলে বিত্তবানদের জন্য হাইটেক কমপ্লেক্স গড়ার স্বপ্নে পরিবেশকেই হত্যা করা হল। বিত্তবান ও প্রোমোটারদের জন্য সুখের সৌধ গড়ার উগ্র মানসিকতা একবারের জন্যও ভেবে দেখা হল না এই অঞ্চলের ভূস্তরের ভিতরকার চ্যুতির কথা। ভাবা হল না উপরিস্তরের এই হাইটেক কমপ্লেক্সের বিশাল স্ট্রাকচারের চাপে মাটির তলদেশ সরে যাবার চেষ্টা করতে পারে। ফলে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর নেমে যাওয়ার আশঙ্কা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই বিচ্ছিন্নতা ও পতনই সৃষ্টি করতে পারে ভয়াবহ ভূমিকম্প। এছাড়াও, মাটি থেকে গাছ উপড়ে ফেলার জন্য মাটি আলগা হয়ে ধ্বসকে আমন্ত্রণ

জানাবে। ঘটে যেতে পারে আরেকটা কয়নার। চাঁদমণির একেবারে মাথার ওপরে আমবুটিয়া ধ্বস ঝুলছে। সামনের কার্সিয়াং পাহাড় ও ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে সে ব্যাপারে ভূ-বিশেজ্ঞরা বার বার সতর্ক করে চলেছেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া দার্জিলিং - হিমালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যে সমীক্ষা করেছে তাতে দেখা গেছে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল এবং ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ৪০০ বার ভূকম্পন হয়েছে। এই সমীক্ষাই প্রমাই করে দার্জিলিং, সিকিম, হিমালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভূস্তর কত অস্থির।

পরিবেশ পরিবর্তনের ধাঁচ মাপতে বেশ কয়েক বছরের গড় হিসেবে নেওয়া হয়। ৪০ থেকে ৪৫ বছরের গড়কে একটা পরিবর্তনের একক ধরা যেতে পারে। ১৮৯১ থেকে ১৯৮০ সাল — এই ৯০ বছরের হিসাবটি ৪৫ বছর করে দুভাগে ভাগ করে দুটি গড় কষা গেলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই হিসেবে দেখা যায়, দার্জিলিং -এ প্রথমার্ধের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৩০৩২ মিমি। দ্বিতীয়ার্ধে সেই গড় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৯৮ মিমি- এ। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত কমে গেছে ১২ শতাংশ। মালদহে কমেছে ৩.৩ শতাংশ। তাপমাত্রার গড় হিসেবে দেখা যায দার্জিলিং-এ প্রথম পর্যায়ের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পরের ৪০ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় এবং মৌসুমী বায়ু আসার পরিমাণও গেছে কমে। আবহাওয়া দফতরের সূত্রে জানা গেছে, গত ৭৫ বছরে (১৯০৯ - ১৯৮০) মৌসুমী বায়ু সবচেয়ে আগে এসেছে ২৬শে মে এবং সবচেয়ে দেরিতে এসেছে ২৫শে জুন। এই সময়ের মধ্যে ২-৩ বছর বর্ষার নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসেছ এবং ৪৭ বার দেরিতে এসেছে।

আগে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটঘাট শুকিয়ে ফেটে যেত। এখন সারা বছর ধরে ভূগর্ভ থেকে জল তুলে শুষ্ক ঋতুতেও মাঠ জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে সারা বছর জমি জলে ডুবে থাকায়, আগে শুষ্ক ফুটোফাটা জমি দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে মাটির অভ্যন্তরে যে শক্তির সঞ্চার ঘটাত, তা ঘটাতে পারছে না। অতএব, প্রাথমিক সাফল্য এলেও মাটির উর্বরা শক্তি যে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তার প্রমাণ সবুজ বিপ্লবের রাজ্য পাঞ্জাব। এর মধ্যেই সে রাজ্যে কৃষি জমির উর্বরা শক্তি আশঙ্কাজনক ভাবে কমে গেছে।

উত্তর- পূর্ব ভারতকে বলা হয় বন ও প্রাণী বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়ায় সেই জীববৈচিত্র্যের পরিবেশ কেমন বিপন্ন তার এক উদাহরণ মণিপুরের ইথাই ব্যারেজ। পূর্ব হিমালয়ের কোলে পাহাড় ও উপত্যকা ঘেরা ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুর। এর আয়তন ২০,৫৭১ বর্গ কিলোমিটার। এর ৯০ শতাংশ জুড়ে নানা দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ, পতঙ্গ, বন্যপ্রাণী ও পাখি ছড়িয়ে আছে। এখানে আছে উত্তর - পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ লোক্তক। এই হ্রদের ওপর অবস্থিত প্রাকৃতিক বিস্ময় ভাসমান কেউবুন-লামজাও জাতীয় উদ্যান। এই ভাসমান উদ্যানেই বাস করে পৃথিবীর বিরলতম সাংগাই হরিণ। মণিপুরে ইথাই ব্যারেজ নির্মাণে পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে সে কথা পরিকল্পনাবিদদের ভাবনার মধ্যে ছিল না। এই বাঁধের প্রথম শিকার যাযাবর শ্রেণীর মাছ। এরা সুদুর মায়ানমার থেকে উজান বেয়ে এই হ্রদে ডিম পাড়তে আসে। এদের আসা এখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। বাঁধ নির্মাণের আগে এই হ্রদেই প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু মাছ পাওয়া যেত। স্থানীয় মানুষের অতি প্রিয় এই মাছের নাম পেংবা। এই হ্রদের ওপর ভাসমান উদ্যান প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। শত শত বছর ধরে নানা আগাছা জমে এর সৃষ্টি হয়েছে। এটি এতই পুরু যে জেলেরা এর ওপর কুঁড়েঘর নির্মাণ করে দিব্যি বসবাস করা শুরু করেছে। স্থানীয় ভাষায় এই ভাসমান উদ্যানের নাম 'ফুমডি'। এরকম যে ফুমডির ওপর মূলত সাংগাই হরিণেরা বাস করে সেটি আয়তনে প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার এবং কয়েক মিটার পুরু। শীতকালে হ্রদের জলের গভীরতা একেবারে কমে আসে। তখন ফুমডি হ্রদের মাটির তলে নেমে আসে, মাটি থেকে উপদেয় দ্রব্য শোষণ করে নিজেকে পুষ্ট করে। বর্ষাকালে হ্রদের জল বৃদ্ধি পেলে সঙ্গে সঙ্গে এরা ভাসমান উদ্যান রূপে আবার ভাসতে থাকে। এইভাবেই শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক চক্রে এক অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে আসছিল। লোক্তক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত (১৯৮১) হবার পর প্রাকৃতিক এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য হ্রদ এখন সারা বছর ভরাট থাকে। তাই ফুমডি এখন হ্রদের তল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে, ফুমডির ঘটছে বিভাজন। নদীর মুখে ক্রমাগত সঞ্চিত হচ্ছে পলি, হ্রদ হচ্ছে ভরাট। ইতিমধ্যেই এর গভীরতা বহু জায়গায় ৬ মিটার পর্যন্ত কমে গেছে। ফল হতে চলেছে ভয়াবহ। মণিপুরের এই দুর্লভ হরিণটি আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। তার সঙ্গে অদৃশ্য হতে চলেছে বেশ কয়েকটি প্রজাতির পাখি।

শেষে বলতে হয়, পরিবেশ ও উন্নয়ন একে অপরের দিকে যেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির জীবনচক্রের কথা ভুলে গেলে চলবে না। আবহাওয়ার রসায়নে অরণ্যের ভূমিকা যেমন সত্য তেমনি সত্য এককোষী অ্যালগির ভূমিকা। কারণ, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীই অপর প্রাণীর দেহ থেকে নিঃসৃত কার্বন ডাই-অকক্সাইডের শরতরা ৮০ ভাগ শোষণ করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা নির্ভর করছে এদেরও ওপর। মানুষ তার উত্তরসূরীদের নিরাপত্তা দানে তার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারে না। মণিপুরে হরিণের বিলুপ্তির শূন্যতায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চমকে পাহাড়ি এলাকা আলোকিত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে মানুষের উত্তরসূরীদের জন্য প্রোথিত হবে অসীম শুষ্কতার হাহাকার। যে কথা মণিপুরের পরিবেশ প্রসঙ্গে সত্য সে কথা সারা পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যও সত্য। অতএব, 'আমরা বাঁচব, ওদেরও বাঁচাব' — এই নিরাপত্তার মধ্যেই আছে উন্নয়ন ও পরিবেশের রাখিবন্ধন।